ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1582-1597
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.167

চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের সামাজিক লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা: একটি সমীক্ষা

ড. জগন্নাথ বড়ুয়া, *সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 22.07.2025; Accepted: 24.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Religion, Society, Culture, Science and self-social structure are all created by humans for the needs of humans. Human social life consists of human religious beliefs, folk culture, worship festivals, rituals, oral traditions, customs, etc. Bengali Buddhists are ancient inhabitants of the Bengali region. The Bengali Buddhists (Barua) of Chittagong, Bangladesh and other Buddhist communities. Among them, various superstitions, folk customs, folk culture and traditions are prevalent in religious and social activities. These are in various ways intertwined with religious worship, customs and social folk culture. According to history, various folk cultures, folk beliefs, and rituals have been established among Buddhists since ancient times. There are various religious rules and folk rituals practiced by Buddhists in this country at the time of birth, death, and marriage. Such as: offering alms, birth of a child, naming, offering food, beginning of education, initiation, ear and nose piercing, marriage, funeral, funeral rites, farewell sermons, etc. Among the marginal Buddhist tribes, there are folk beliefs, oral traditions, customs and traditions such as shrine worship, tree worship, vowing, Satyapir's Sinni, Alplani (Halkarshan festival), river worship, finding jinn-bhoot-pari, arrow-caster-doctor, Manasa worship, gods and goddesses, Maan, Buhyachakra, Radapoye, Chaitra Sankranti or Vaisavi etc. Apart from this, there are many other indigenous folk customs, beliefs, culture and oral traditions prevalent. The article under discussion reviews the social folk culture and oral traditions prevalent among the Buddhist community in Chittagong and its influence.
Keywords: Chattogram, Barua Buddhists, Folk Culture, Funeral Rites, Chaitra Sankrant

সংস্কৃতি (Culture) একটি জাতির আত্মপরিচয়ের বাহন। লোক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কার, প্রথা, জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, শিল্প-বিনোদন ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি হলো লোকসংস্কৃতি। এটা সম্পূর্ণই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনবোধ। এ সংস্কৃতি তাদের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। নৃতত্ত্বের বিচারে বাঙালির দেহে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তধারা প্রবাহমান। এদিক থেকে বাঙালি একটি শংকর জাতি। বাংলার লোকসংস্কৃতিতেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। বৌদ্ধরা আদিকাল থেকে লোকসংস্কৃতি লালন করে আসছে। ঐতিহ্যগতভাবে বৌদ্ধদের লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরার প্রভাব বাঙালি সংস্কৃতিতে অত্যধিক। বাঙালি বৌদ্ধরা বঙ্গীয় অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। এদেশে বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ধারাও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাঙালি সংস্কৃতিতে বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, লোক উৎসব, লোকসংস্কৃতি, মৌখিক পরম্পরা প্রভৃতি সৌষ্ঠব। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশে সমতলী বড়ুয়া বৌদ্ধ ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় চাকমা, মারমা, রাখাইন, চাক, ম্রো, খুমি, খিয়াং প্রমুখ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাস। বিনয় সম্মত ধর্মীয় বিধিবিধান অনুশীলনের পাশাপাশি বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ও চিন্তায় বিভিন্ন কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব প্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকে এগুলো

নানাভাবে ধর্মীয় পূজা-অর্চনা, রীতি-নীতি এবং সামাজিক লোকাচারে আবিষ্ট হয়ে আছে। বৌদ্ধদের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা ও সামাজিক লোকাচার বিদ্যমান। যেমন-সাধভক্ষণ, সন্তানের জন্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাসন, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষাগ্রহণ, কর্ণ ও নাসিকাছেদন, লোকউৎসব, আবাহ-বিবাহ, শবসৎকার, অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া, পরিত্রাণ দেশনা প্রভৃতি। প্রান্তিক বৌদ্ধ জনজাতিসত্তার মধ্যে মাজার পূজা, বৃক্ষ পূজা, মানত করা, সত্যপীরের সিন্নি, আল্ললানী (হলকর্ষণ উৎসব), চৈত্রসংক্রান্তি বা বৈসাবি, নদীতে স্নান, অশুভ দৃষ্টি, জীন-ভূত-পরীতে পাওয়া, বাণ টোনা-বৈদ্য, তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মাঁন, মনসা পূজা প্রভৃতি লোকাচার, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং মৌখিক পরম্পরা রীতি ও লোকসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে আরো অনেক স্বজাত লোকসংস্কৃতি ও পরম্পরা রীতি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত সামাজিক লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা প্রথা এবং তার প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রায়োগিকতা ও যৌক্তিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াঃ

সমাজ গবেষকগণ সমাজ-সংস্কৃতি গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের নানা গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) রয়েছে। যেমন– ঐতিহাসিক পদ্ধতি, সনাতনী পদ্ধতি, নৃ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, মাঠ-জরিপ সমীক্ষা পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content analysis method) ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট গবেষণায় কোন পদ্ধতি অনুসৃত হবে তা নির্ভর করে ঐ গবেষণার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর ওপর। "চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের সামাজিক লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরাঃ একটি সমীক্ষা" বিষয়টি (Text) এখানে তথ্য-উপাত্ত অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও সমীক্ষণে মাঠ সমীক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সমাজ, সংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক লোকসংস্কৃতি, লোকাচার, মৌখিক পরম্পরা ও তার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিরও আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক বৈচিত্র্য অত্যন্ত প্রাচীন। এ গবেষণার সাথে অনুসঙ্গ রূপে মানববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নৃতাত্ত্বিক প্রভৃতি শাখার যোগসূত্র রয়েছে। এ কারণে গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে ইতিহাস, ঐতিহাসিক, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা ও নৃবিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পর্যালোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে জাতির উৎস, আচার-সংস্কৃতি, জীবনবোধ, শিষ্টাচার, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক রীতি-নীতি, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে গবেষণা পদ্ধতি মূলত তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(ক) লিটারেচার রিভিউ

(খ) ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা

(গ) তথ্য-উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ। এতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে দুইটি উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। যথা- i. প্রাথমিক উৎস (Primary sources)-বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদে বসবাসরত বৌদ্ধদের কাজ থেকে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও সাক্ষাৎকার এই গবেষণার প্রাথমিক উৎস। ii. দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary sources)-এর উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতাঃ

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা অনেকের কাছে অজ্ঞাত। যা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাহিরে। প্রান্তিক এ জনজাতির অতীত ও বর্তমান সময়ের বৌদ্ধ লোকসংস্কৃতি গবেষণা অতীব শ্রমসাধ্য কাজ। বিশেষ করে পণ্ডিত, সাহিত্যিক, গবেষকগণও এ বিষয়ে তেমন এগিয়ে আসেনি। অথচ বাংলা ভাষাভাষী আদি জনগোষ্ঠী বৌদ্ধদের লোকসংস্কৃতি এবং মৌখিক পরম্পরা সংস্কার বিষয়ে প্রত্যেকের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাধর্মী এ বিষয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা প্রথা ও তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। এর ফলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারা, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা রীতি-নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সামাজিক রীতি-নীতিতে লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা প্রথার শেকড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে সৃজিত হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা রীতিঃ

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। বৌদ্ধ কালপর্বের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালির গৌরব গাথা অনন্য। এদেশের বৌদ্ধরা স্বাধীনভাবে তাঁদের সকল প্রকার ধর্মীয় পূজা-পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচার ও সংস্কৃতি চর্চা ও বিশ্বাসে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে তথা বৃহত্তর চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পূজা-অর্চনা, লোকসংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। এ সকল ধর্মীয় ও সামাজিক পূজা-পার্বণ ও লোকাচারসমূহ সাধারণত লোকসংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাস নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে

এখানকার বৌদ্ধ অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানসমূহ ধর্মীয় ও সাামাজিক লোক-বিশ্বাসে প্রতিপালন করা হতো। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হতে বড়ুয়া বৌদ্ধদের আর্য ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি প্রচারিত হয়। সে থেকেই চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে অর্থাৎ প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানসমূহের প্রথম গোড়াপত্তন হয়েছিল।[১]

কালপর্যায়ে নানাভাবে সামাজিক লোকসংস্কৃতি এখানে প্রচার-প্রসার লাভ করে। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির ত্রিমাত্রিক লোকাচারের আর্বতে মানুষ বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত। ধর্মের প্রাণ হচ্ছে 'বিশুদ্ধ বিশ্বাস' (belief) এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সামাজিক জীবনাচরণ ও সংঘবদ্ধতা। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে বহুমাত্রিক দিক থেকে সংহত করার জন্য প্রতিটি সমাজেই ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। প্রত্যেকেরই রয়েছে ধর্মীয় শাস্ত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, মন্ত্র, স্তোত্র ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি যেহেতু প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তখনকার যুগ আর এখনকার যুগ বেচিত্র্য, জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিন্নতা রয়েছে। তৎকালে মানুষ আদিম (Primitive) কুসংকার (Superstition), লৌকিক (Earthly), লোকসংস্কৃতি (Folk Culture) ও মৌখিক পরম্পরা (Oral Tradition) সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সেই লোকাচার, অপসংস্কৃতিগুলো আজো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। বৌদ্ধ সমাজে বিশেষত Religious Rituals and Folk Belief ব্যাপক ভাবে প্রচলিত রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লাভ ও চর্চার ফলে তার আড়ষ্টতা কিছুটা শিথিল হলেও এখনকার লোকজীবন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সমাজ প্রেক্ষিতে বৌদ্ধদের মধ্যে লোক-সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, বড়ুয়া বৌদ্ধদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ও সামাজিক লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতে চিন্তারাজ্যে এক তুমুল বিপ্লব ঘটেছিল। বহু শতাব্দী ধরে এদেশের হিন্দু আর্যগণ যে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব গড়ে তুলে ছিল তার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন গৌতম বুদ্ধ।[২]

প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকাচার, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা রীতি বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বায়ন যুক্তি-তর্ক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ। এ যুগের মানুষ বস্তুবাদে বিশ্বাসী, বাস্তাবিকতায় বিশ্বাসী, শাস্ত্রীয় মিথ, অন্ধবিশ্বাস, লৌকিকতত্বকে সহজে মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা থেরবাদ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৌদ্ধদের প্রকৃত আচার-আচরণে, বিনয় বিধানের অন্তরালে থাকে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি, বিশ্বাস, আচরণ, পূজা-পার্বণ, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। এমন কি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় লৌকিক ধারায় প্রচলিত অলৌকিকত্বের বেড়া ভেঙ্গে জীবনাশ্রিত মৌলিক আচার সংস্কৃতি হিসেবে রূপে লাভ করেছে। এর অসংখ্য উদাহরণ সমতলীয় বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে সচরাচর বিদ্যমান।[৩]

ইতিহাস মতে, পাল ও গুপ্ত যুগের পরে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নানা লোকাচার, লৌকিক প্রথা ও লোকসংস্কৃতিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ বিপর্যয় বৌদ্ধদের সমাজ জীবনে ও ধর্ম জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চারটি বিশেষ শাখা-বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রযান। এ সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও মতভেদের জন্য এ লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মধ্যযুগের অন্ধকার পর্যায় পরবর্তী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক জাগরণ ঘটেছিল। তবে সুপ্রাচীন কাল থেকে বুদ্ধের মূর্তি তৈরি প্রথা আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর পূজার প্রচলনও আরম্ভ হয়েছিলো। পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণ্যের ধর্মায়তন স্বীয় প্রভাবের ফলেই অলক্ষে কখন ভক্তদের মধ্যে বুদ্ধপূজার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল তা বলা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার।[৪]

সামাজিক লোকাচার ও সংস্কৃতি:

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সামাজিক রীতি-নীতি লোকসংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। আবহমান কাল থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পূজা-পার্বণ ও সামাজিক রীতি-নীতিতে বিভিন্ন প্রকার মৌখিক পরম্পরা প্রচলিত কুসংস্কার বিদ্যামান। পূজাপার্বণ ও সামাজিক লোক উৎসবের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক রীতিনীতির একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম, সমাজ ও ভৌগোলিক ভেদে এই অনুষ্ঠান নানা রকম হয়ে থাকে। বৌদ্ধদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানগুলো অনেকখানি বাঙালি জাতির নিজস্ব প্রাণরসে সঞ্জীবিত। বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের পূজা-পার্বণ ও সামাজিক লোক-উৎসবের মধ্যেও বাংলার বৌদ্ধ সমাজের স্বকীয়তা ফুটে উঠে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের সামাজিক রীতি-নীতি, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বা মিথ্যাদৃষ্টিতে নিমজ্জিত হয়ে অন্ধভাবে লোকসংস্কৃতিকে প্রতিপালন করেন। ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচারে মেলা একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। বৌদ্ধদের মধ্যে এ মেলায় বিভিন্ন অনুসঙ্গের সম্মিলন হয়ে থাকে।[৫]

বৌদ্ধদের মধ্যে লোকাচার হিসেবে বিভিন্ন পূজার প্রচলন হয়েছে। 'পূজা' বহুল পরিচিত একটি অর্থবোধক শব্দ যা বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। পূজা শব্দের অর্থ মূলত অর্চনা, আরাধনা, ভক্তিপ্রদর্শন এবং শ্রদ্ধা

জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়। Vijaya Samarawickrama বরেছেন, The puja falls into the category of `Sila' (Discipline) which is the first of the stages along the path, the others being `Samadi' (concentration) and `Panna' (wisdom). It primarily involves perfect speech and perfect action.[৬] ইতিহাস মতে, প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিশরণ মন্ত্র রূপে গৃহীত হয়েছিল পরবর্তী যুগে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ জ্ঞান-কল্যাণ-শক্তির প্রতীক রূপে ত্রিমূর্তি ধারণা করে 'বুদ্ধ' বৌদ্ধদের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কালক্রমে বৌদ্ধগণ কেবল বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতীক পূর্ণ করে সন্তুষ্ট হলেন না। ত্রিরত্ন কে মানবীর মূর্তিতে রূপায়িত করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। পণ্ডিত সিদ্ধ হর্ষের সংগৃহিত ধাতব মূর্তি ক্রয়ের একটি ধর্মদেবতার প্রতিমা। এখানে ধর্ম বুদ্ধ দেবতার দক্ষিণে পদ্মাসনে চতুর্ভূজা নারী মূর্তি উপবিষ্টা।[৭]

পুরাতত্ত্ববিদ Cunningham এর মহাবোধি চিত্রে দেখা যায়-বুদ্ধের বামে সংঘ ত্রিভুজা নারী মূর্তিতে এবং ধর্ম পুরুষ রূপে বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেছে। তার ধর্ম মতে যাগ যজ্ঞ, ফেস প্রভৃতির কোন পূজার করার নির্দেশ নেই। তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজার ব্যবস্থাও তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোক সাধারণের মনে বৌদ্ধ সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে ছিল এবং বৌদ্ধ সমাজ ধর্মহীন ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে, Sir Charles Eliot তাঁর প্রণীত Hinduism and Buddhism গ্রন্থে বলেছেন, "The aberration of Indian religion is not due to its inherent depravity but to its University. In Europe those who follow disreputable occupation rarely suppose that they have anything to do with church. In India robber's murderer's gamblers, prostitutes and maniwes all have their appropriate gods."[৮]
বৌদ্ধরা ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিল কিন্তু সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে তাদের বৌদ্ধ বলা অযৌক্তিক হবে। কারণ তারা বৌদ্ধধর্মের, বৌদ্ধ সংঘের বাহিরে তাদের সম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার বিরোধী হয়। স্যার চার্লস ইলিয়াস লিখেছেন, It aimed not at founding a seat but at including all the world as lay believers of easy farms. This ascendant but its effect was disastrous when decline began. The line dividing Buddhist lay man from ordinary thirds became loss and less marked.[৯]

কল্পতরু দান: এটি যেমন ধর্মীয় রীতি বা বিশ্বাসের অংশ তেমনি সামাজিক লোক সংস্কৃতি ও লোকাচার হিসেবেও তা অধিক সমাদৃত। উনবিংশ শতকের দিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্পতরু দানের প্রথা প্রচলিত হয়। আড়ম্বরপূর্ণভাবে বিভিন্ন উৎসব বিশেষ করে কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে কল্পতরু দান বৌদ্ধ সম্প্রদায়র একটি ঐতিহ্য। 'কল্প' ও 'তরু' দুই অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে 'কল্পতরু' শব্দটি এসেছে। এখানে 'কল্প' অর্থ সময়ের নির্দিষ্ট পরিমাপ। 'তরু' অর্থ গাছ বা বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এখানে 'তরু' বলতে কল্পনায় অঙ্কিত সুসজ্জিত গাছকে বোঝানো হয়েছে। যে বৃক্ষ হতে কল্পনানুয়াযী বস্তু সামগ্রী পাওয়া যায় তাকে কল্পতরু বৃক্ষ বলে। সাধারণত বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বিহারে কঠিন চীবর দানে এই কল্পতরু দান করতে দেখা যায়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে কল্পতরু দান করলে জন্ম জন্মান্তর মানুষের অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ, এর কাছে কিছু চাইলেই পাওয়া যায়। এই কল্পতরু কল্পনার মধ্যে মানুষের আদিম চাওয়া-পাওয়ার বাসনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণত আশ্বিন-কার্তিক মাসের মধ্যে বাঙালি বৌদ্ধরা কল্পতরু উৎসব পালন করেন। মঞ্চের মধ্যে একটি সজ্জিত চারাগাছ স্থাপন করে তার ডালে নানাবিধ ব্যবহারিক সামগ্রী দেওয়া হয়, যেমন- কাপড়, খাতা, পেন্সিল, সাবান, টাকা প্রভৃতি। তাছাড়া কল্পতরুকে নানাবিধ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। এভাবে বৌদ্ধরা কল্পনার বৃক্ষ দান দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূরণের জন্য কল্পতরু দান দিয়ে থাকে।[১০]

বৌদ্ধধর্মীয় সংগীত ও কীর্তন: বাংলায় বৌদ্ধধর্মীয় সংগীত ও কীর্তনের বিকাশ ঘটেছে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। বৌদ্ধ সংগীত ও কীর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের জীবন কাহিনি, বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ও শিক্ষাগুলোকে জনসাধারণের কাছে প্রচার করা। বৌদ্ধ ধর্মীয় কীর্তন বা সংগীত বহু সামাজিক লোকপ্রথা ও সংস্কার বিদ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মীয় সংগীত ও কীর্তন বিভিন্ন ধারায় প্রচলিত– ক. বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সুর ও ছন্দে প্রকাশ করা। খ. বৌদ্ধধর্ম ও বিনয়ের নিয়ম-নীতি ও শিক্ষাদর্শ তুলে ধরা। গ. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, প্রবাদ-প্রবচনগুলোকে ব্যাখ্যামূলক আকারে গাওয়া। ঘ. বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, অন্যান্য দেবদেবীদের গুণকীর্তনমূলক গান। ঙ. ধর্মীয় গাথা ও শ্লোকের বিষয়বস্তুকে কীর্তনের সুর ও ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা।[১১]

বৃক্ষ পূজা: বৌদ্ধরা বৃক্ষকে অর্থাৎ বৃক্ষ দেবতাকে প্রায় সময় পূজা ও বন্দনা করে থাকে। বড়ুয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা অষ্টমীর সময় সকালে বৃক্ষ পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা বুদ্ধ বোধিবৃক্ষেরি নীচে বসে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা সাধন করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তাই বৃক্ষকে পূজা ও বন্দনা করে থাকে। শ্রীলংকান বৌদ্ধরা বোধিবৃক্ষকে বুদ্ধ জ্ঞানে পূজা-বন্দনা করে থাকে। তারা মনে করে এই সেই পবিত্র বৃক্ষ যে বৃক্ষের ছায়ার নিচে বসে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাই তারা যুগ যুগ ধরে পবিত্র মনে বোধিবৃক্ষকে পূজা-বন্দনা করে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম মতাদর্শে বৃক্ষকে পূজা

করা কুসংস্কার ও লৌকিক আচার বিশেষ। কারণ বুদ্ধ নিজে কখনো এমন উপদেশ কাউকে দেননি যে বৃক্ষকে পূজা কর। বরং বুদ্ধ নিষেধ করে নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য বলেছেন। প্রকৃত অর্থে বৃক্ষ বৌদ্ধধর্মে লৌকিক পূজা। কিন্তু দেখা যায় বোধিবৃক্ষের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীলংকাবাসীরা সবসময় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বোধিবৃক্ষ পূজা-বন্দনা করে থাকে।[১২]

আট্‌কী মা পূজা: চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তাকে আট্টক্কিনি পূজা বলা হয়। এ আট্‌কী মা পূজা বাঙালি বৌদ্ধদের বহুল প্রচলিত একটি পূজা। আর এই পূজা জন মানসে বহুল ভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বলা যায় সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার প্রথা প্রচলিত আছে। যে কেউ যদি বিপদে পড়ে বা ব্যধিগ্রস্থ হয় তাহলে এইসব কিছু থেকে অমঙ্গল রক্ষা পাওয়ার জন্য এই পূজা অর্চনা করে থাকে। বাস্তবপ্রেক্ষাপটে এই আট্‌কী মা পূজার কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। মানুষ মিথ্যা ও অজ্ঞানের বসবর্তি হয়ে সামাজিক লোকাচারে আদৃত কাল্পনিক এসব পূজা লৌকিক আশ্রয়ে করে থাকে।

নদীতে মন্‌সা পূজা: বেহুলার বাসর ঘর একটি ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব থেকে মানুষের মনে নিয়ে এসেছে এক মহা বিস্ময় মহা জিজ্ঞাসা। এই স্মৃতি চাঁদ সাগরের, দৃঢ়তা, পদ্মার কোপ, মনসা মঙ্গল, নিতাই বাবু ও বেহুলার আলৌকিক সতীত্বের করুন কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত। প্রাচীন প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখ থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে তাও এতে সংস্থায়িত করা হয়েছে। কাহিনী স্থল বগুড়া। বেহুলা ও লক্ষিন্দর এর কাহিনী সেন যুগের অনেক পূর্বেকার ঘটনা। বেহুলার বাসর ঘর একটি অকল্পনীয় মনুমেন্ট। বেহুলা তার মৃত স্বামী লক্ষিন্দরকে নিয়ে বাসর ঘরের দরজায় বসে অঝোর নয়নে কাঁদছে। কারণ লক্ষিন্দরের লোহার বাসর ঘর। তাতে এ করুণ বিলাপ মনে হয় আজো শোনা যায়। বেহুলা বদ্ধ দরজার পাশে বসে বিনয় কণ্ঠে গাইতে লাগলো-

দাও মা দরজা খুলে
সিথির সিঁদুর মুছিয়াছি নয়নের জলে,
বাসর ঘরে দংশিল মা কাল নাগ আসিয়া,
তোমায় বুঝাব মাগো কোন ধনদিয়া।[১৩]

বেহুলার ধোপানীর প্রতিউত্তরে বললেন,

বিয়া রাতে প্রতিমোর খাইল নাগিনী
প্রতিলয়ে ভেসে যাই আমি অভাগিনী
কি আর কহিব মাসী তোমার নিকট
অভাগিনী নারী আমি পড়েছি সংকটে।

লক্ষিন্দরের পিতা ছিলেন চাঁদ সওদাগর, মাতা সুনুকা রানী। বেহুলার পিতার নাম মুক্তেশ্বর ওরফে বাসোবানিয়া আর মাতার নাম কমলাদেবী। বেহুলার করুণ কাহিনী আলোকপাত করতে গেলে পদ্মাদেবীর কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মার কূলে জন্ম হয়েছে বলে এই দেবীর নাম পদ্মা। এই দেবী বিষহরী নামেও পরিচিত। পদ্মা অযোনি সম্ভাবা চতুর্ভূজা ও ত্রিনয়ী স্বামীর নাম জরৎকারু মনিরাজ। পদ্মাদেবীর আটটি সর্প সন্তান ছিল।
পদ্মাপুরাণে উক্ত আছে–

'কাঁদরে সুনুকা দেবী কাঁদে সদাগর
কাঁদে আজো বেহুলার বিরহ বাসর।'

প্রকাশ থাকে যে এই দেবীর পূজা মন্‌সা পূজা। শ্রাবণ সংক্রান্তিকে অনুষ্ঠিত হয়। তবে স্থান বিশেষে সময়ের ব্যবধান বিচিত্র নয়। পূজা সকাল ১০-১২ টায় নদীতে ভেসে দিয়ে থাকে। ভেদে দেওয়ার আগে জোয়ার বা উলু দিয়ে থাকে আর সাথে স্নান করে থাকে। কিন্তু লোক এই মন্‌সা পূজা ডান হাতে এবং কিছু লোক বাম হাতে দিয়ে থাকে এরও অনেক কারণ আছে। ভেহুলা উজান যাওয়ার ছয়মাস পর লক্ষিন্দর জীবিত হওয়া, যাদু দিয়ে জীবিত মৃত হওয়া ইত্যাদি। হিন্দু ধর্মের জাত কাহিনীর এই বেহুলা লক্ষিন্দর তথা পদ্মা দেবীর মন্‌সা পূজা লোক লৌকিক কুসংস্কার রীতি হিন্দু ধর্মে নয়। যুগের সন্ধিক্ষণে বাঙালি বৌদ্ধদের রীতি-নীতিতেও পরিণত হয়। বড়ুয়া বৌদ্ধদের মাঝে এখনো কিছু লোক এই লৌকিক মন্‌সা পূজা অপসংস্কৃতির পূজা নদীতে বা পুকুরে তার স্মরণে পূজা দিয়ে থাকে। মন্‌সা পূজার উপকরণ সাধারণত যেসব লাগে তা হল- চাউল, দুধ, কলা, নারিকেল, ফুল, আখ, মোমবাতি, আগরবাতি, দুলাকের কলার বাক্‌ল, সিঁদুর প্রভৃতি।

দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা: বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দীক্ষা/প্রব্রজ্যা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। ন্যূনতম সাত বছর বয়স্ক শিশুকে দীক্ষা দেওয়ার রীতি আছে। প্রব্রজ্যার জন্য প্রয়োজন আট প্রকার দ্রব্য, যথা-ত্রি-চীবর (উত্তরাসঙ্গ, সংঘাটি, অন্তবাস), ভিক্ষাপাত্র, জলছাকনী বা গামছা, ক্ষুর ও কটিবন্ধনী, সূই-সূতার পিন্ড। ধর্মীয় বিধান মতে, উপাধ্যায় ভিক্ষু প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে সদ্ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পবিত্র পুণ্যানুষ্ঠান।[১৪] এটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও লোকাচারের অনেক কিছু এতে সংশ্লিষ্ট।

পরিত্রাণ দেশনা: বাংলাদেশের বৌদ্ধরা ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচার হিসেবে পরিত্রাণ সূত্রপাঠ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান বলে সম্পাদন করে থাকে। থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কার্য। বৌদ্ধরা রতন সূত্র, মৈত্রী সূত্র, মঙ্গল সূত্র, পরাভব সূত্র, বোধ্যঙ্গ সূত্র, কল্হবিবাদ, অটানাটিয় পরিত্ত, মোর পরিত্ত, খন্ধ পরিত্ত প্রভৃতি সূত্রপাঠ করেন। এ পরিত্ত সূত্র সম্পর্কে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন, 'যখন কালক্রমে বৌদ্ধ গৃহস্থ সমাজ গঠিত হয় সেই সময় হতে প্রচলিত হিন্দু বা আর্য গুহ্যমন্ত্রের অনুকরণে পালি ও মিশ্রিত ভাষায় বৌদ্ধ পরিত্রাণ সূত্রের রচনা আরম্ভ হয়।' বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ। এ সূত্রের দুটি দিক আছে-লৌকিক বা জাগতিক এবং লোকোত্তর বা পারমার্থিক। লৌকিক হলেও কালে কালে এ সূত্র পাঠের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় বলে এ ব্যাপক পরিচিতি লোকমুখে আছে। পালি পরিত্ত শব্দের অর্থ পরিত্রাণ, সংরক্ষণ বা নিরাপত্তা। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পরিত্ত সূত্র পাঠ করে থাকে।[১৫]

সাধভক্ষণ: সাধভক্ষণ হচ্ছে খাওয়ার স্বাধীনতা। প্রথম কোনো গর্ভবতী নারীকে সাতমাসে বা নবম মাসের সময় উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্যের মাধ্যমে সাধ ভক্ষণ করতে দেওয়া হয়। এর পূর্বে গর্ভবতীর পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত পান (দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, দধি ও মধু) খেতে দিতে হয়। তাছাড়াও সাধভক্ষণ উপলক্ষে গর্ভবতী রমনীকে পিতৃগৃহ থেকে নতুন উন্নত বস্ত্র প্রদান এবং বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি, গুড়োপিঠা, বাশুটি পিঠা রান্না করে আপ্যায়ন করানোর জন্য মেয়ের মা, মাসী, পিসি ও আত্মীয়-স্বজন মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে আসেন। এসময় তার যা মনে খাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে সেই খাদ্যদ্রব্যগুলো ভক্ষণ করতে দেওয়া হয়। কিছু দিন পর তাকে আবার বার মাসের নানান ফলও খেতে দেওয়া হয়। বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইহা 'হাদি' বা 'হাদি খাওয়ান' নামে পরিচিত। (হাদি শব্দটি সাধের বিকৃত রূপ)। বৌদ্ধ দৃষ্টিতে সাধভক্ষণ একটি সামাজিক লৌকিক আচার অনুষ্ঠান।

সন্তানের জন্ম : বড়ুয়া বৌদ্ধদের রীতি অনুসারে সন্তান প্রসব হলে মহিলারা উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। পুত্র সন্তান হলে পাঁচবার আর কন্যা সন্তান হলে তিনবার উলুধ্বনি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ঘরে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। প্রসূতি এবং নবজাতককে গরম পানি দিয়ে গোসল করে পাক পবিত্র করা হয়। তারপর নবজাতকের সারা গায়ে তৈল মেখে দেওয়া হয় এবং মধু খাওয়ানো হয়। শিশু জন্মের তিনদিন, পাঁচদিন বা সাতদিন পর মাথার চুল কামানো হয়। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'হুদ'। প্রসবের প্রায় পনের দিন পর্যন্ত প্রসূতি অশুচি থাকে। সংসারের কোন কাজে তাকে অংশ নিতে দেওয়া হয় না। নব জাতকের নাভি সম্বলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতিকে মন্দির-মঠ (বুদ্ধ বিহার) কিংবা পূজার ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। পূর্বে বৌদ্ধদের পরিবারের সন্তানাদি বধুর পিতৃগৃহে প্রসব করার প্রথা/রীতি ছিল। বর্তমানে এ প্রথা নেই বললেই চলে।

শিশুর নামকরণ: বৌদ্ধদের মাঝে ছেলে-মেয়েদের নামকরণ ও দোলনায় তোলা একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। দোলনায় তোলা এবং আসল নামে নামকরণ করা হয়। জন্মের পরেই আদর করে অনেকে পছন্দ মত নাম রাখে। এটি ডাক নাম। আর দাদা-দাদী, আত্মীয়-স্বজন বই, খাতা, পেন্সিল, কলম (শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতীক), বোধিবৃক্ষের পাতা (বীর্য ও প্রজ্ঞার প্রতীক), লজ্জাবতী পাতা (লজ্জার প্রতীক), নিদ্রালী পাতা (অধিক নিদ্রার প্রতীক), পাথর (গাম্ভীর্যের প্রতীক), মনকাঁটা (স্মরণ শক্তির প্রতীক), একখন্ড লৌহা (শক্তি ও সাহসের প্রতীক) ইত্যাদি বিছানার পাশে রেখে শিশুকে দোলনায় শুইয়ে দেয়। মোমবাতি জ্বালানোর মধ্য দিয়ে পছন্দের নামটি শিশুর আসল নাম রাখা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গণক ব্রাহ্মণকে দিবে, চিকুজী কুষ্ঠি করে তদানুসারে আসল নাম ঠিক করা হয়। আজকাল বড়ুয়া সমাজে বৌদ্ধ হিন্দু মিশ্রিত আধুনিক নামই রাখা হয়ে থাকে। যেমন বেনীমাধব, সমরেন্দ্র, শশাংক, সুধাংশু, শান্তিবালা, সুধাসিনী, দীপক, সুজাতা, নির্মল, তৃপ্তি, দীপা ইত্যাদি উপাধি হিসেবে চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা লিখেন বড়ুয়া আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা লেখেন চাকমা, মারমা, রাখাইন, নোয়াখালি-কুমিল্লা অঞ্চলের বৌদ্ধরা লেখেন সিংহ, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধরা লিখেন এক্কা, টপ্য, কেরকাটা, মিনজি, মাঝে মাঝে বড়ুয়ারা আবার প্রাপ্ত বা খেতাবও লেখতে দেখা যায়। যেমন-মুৎসুদ্দী, তালুকদার, চৌধুরী, সিকদার, মহাজন, রায় বাহাদুর।

অন্নপ্রাসন; বৌদ্ধরা গৃহে পুত্র-কন্যার আগমনকে সুখের বলে মনে করে থাকে। সেই সাথে পুত্র-কন্যা মুখে প্রথম আহার দেওয়াকে অন্নপ্রাশন বলে। অন্নপ্রাসনকে আঞ্চলিক ভাষায় 'ভাত ছোঁয়ানী' বলা হয়। শিশুর মুখে অন্ন দেওয়া একটি আনন্দ অনুষ্ঠান। কোন পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে পঞ্জিকা তারিখ দেখে ঠিক করে মস্তক মুণ্ডিত করে স্নানের পর শিশুকে নববস্ত্র পরিধান করে মাথায় টোপড় পরানো হয়। তারপর বৌদ্ধ বিহার বা বটবৃক্ষের মূলে শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয়। উপাসনা শেষ করে বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ভিক্ষুকে দিয়ে প্রথমে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়। সাধারণত শিশুদের ৫ থেকে ৭ মাস বয়সে কোনো শুভদিনে অন্নপ্রাসন করতে হয়। সেদিন থেকে শিশুকে অল্প অল্প অন্ন খেতে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, মিষ্টান্ন বা পায়েস তৈরি করে বুদ্ধপূজাদি দিয়ে বিহারে বা মানতকৃত স্থানে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ সমবেত হয়ে মামা বা পিতামহ কিংবা পিতামহী শিশুর মুখে রূপা বা সোনার কাটি বা চামচ দ্বারা পায়েস দিয়ে অন্নপাসন করানো হয়। এ দিন শিশুকে নতুন জামা-কাপড়াদি উপহার দেওয়া হয়। এর আগে শিশুকে নিয়মিত মায়ের দুধ বা বিকল্প দুধ খেতে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে ভিক্ষুদের পিন্ডদান কিংবা সংঘদান এবং বয়বৃদ্ধলোক ও আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এ সময় অভিভাবকগণ নতুন থালা (অন্নের

প্রতীক), গামছা (দীর্ঘায়ুর প্রতীক) এবং কাপড় (লজ্জা নিবারণের প্রতীক) উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়। সমাজে অন্নপ্রাসন একটি নিয়মিত ও চিরাচরিত আনন্দময় অনুষ্ঠান।[১৬]

বিদ্যারম্ভঃ বিদ্যারম্ভ বড়ুয়া বৌদ্ধদের আর একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আধুনিক বৌদ্ধ সমাজে কোনো শুভদিনে শিশুর বিদ্যারম্ভ করা হয়। এদিনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পঞ্জিকার দিনক্ষণ দেখে শিশুর বিদ্যারম্ভ করা হয়। শিশুর বয়স যখন চার-পাঁচ তখন এ অনুষ্ঠান হয়। এ সময় শিশুকে বই কলম প্রদান এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এজন্য পঞ্জিকা দেখে শুভতিথি নক্ষত্র বিচার করা হয়। থবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকের আর্থিক সংহতি এবং সদিচ্ছার উপর এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদনঃ বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে মেয়েদের কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদনকে আঞ্চলিক ভাষায় কান ফুড়ানী ও নাক ফুড়ানী অনুষ্ঠান বলে। বিবাহের আগে বৌদ্ধ কুলপুত্রকে যেমন প্রব্রজ্যা দীক্ষা নিতে হয়, তেমনি মেয়েদের বিবাহের আগে কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করা অনিবার্য বলে মনে করেন। কারণ বিয়ের আগে মেয়েদের কান ও নাক ফুড়ানো হয় তারা যেন বিবাহের সময় স্বর্ণালংকার গুলো নাকেও কানে পরিধান করতে পারে। বড়ুয়া বৌদ্ধরা এ অনুষ্ঠান আড়ম্বর পূর্ণভাবে করে থাকে। এ আনন্দঘন জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী সকলকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়। আর সে উপলক্ষে সাধ্যমত অতিথি আপ্যায়নের খাওয়া ও মেলা দিয়ে থাকেন। এ অনুষ্ঠান সাধারণত দুপুর বেলায় করার পর। ইহাতে কর্ণ ছেদনের পূর্বে বোনের জামাই ও দাদা-দাদীরা সকলে মিলে মেয়ের আত্মীয় স্বজন থেকে বায়না ধরে এবং সকলে আনন্দ উল্লাস করে থাকেন। কান ফুড়ানী ও নাক ফুড়ানী অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বা আকর্ষণীয় দিক হল শিয়াল প্রদান অর্থাৎ কান ফুড়ানোর পর এদিন মেয়ের সকল আত্মীয় স্বজন কানের বালি, স্বর্ণ, জামা, পেন্ট, স্কাট, সেলোয়ার কামিজ, টাকা, বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে থাকেন। এগুলো শিয়লি করে লিখে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে তার ঐ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

বিবাহ ও সামাজিক প্রথাঃ বিবাহ বা পরিণয় প্রথা একটি বৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠান বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ প্রথার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধ মতে, বিবাহের পূর্বে বর কনেকে বিবিধ গৃহকর্ম সম্পাদন ও ভিক্ষুদের নিকট 'মঙ্গলসূত্র' শ্রবণ করতে হয়। তবে বর্তমানে এ অনুষ্ঠানের কোন সর্ব সম্মত বিধি বা নিয়ম করা চলে না। তথাগত বুদ্ধ বিবাহ প্রথা সম্পর্কে কোন উপদেশ প্রদান করেননি। উল্লেখ থাকে যে, বৌদ্ধ আচরণে বিবাহ বা পরিণয় প্রথা সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া যায় না। তাই বুদ্ধ পরিণয় প্রথা সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করেননি। তবে তিনি তৎকালীন পরিণয় প্রথা সম্পর্কে কোন বিরোধিতাও করেননি বলে ধারণা করা হয়। তবে বুদ্ধ শুধু বারংবার বিবাহ প্রথা সম্পর্কে অনীহা ও অনুৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও বুদ্ধ সব সময় মানুষকে প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগী হওয়ার জন্য উৎসাহ দান করেছেন। বুদ্ধের বিবাহ প্রথার অনীহা লক্ষ্য করে প্লেটো বলেছেন- 'এ জগৎ বা ভব পৃথিবীতে যদি পরিণয় প্রথা না থাকতো তাহলে এ জগৎ ক্রমে নিঃস্ব, জনশূন্য হয়ে যেতো।' বিশ্বের সকল সভ্য মানব সম্প্রদায় বিবাহ প্রথাকে স্বীকার করে নিয়েছে। বৌদ্ধধর্মের চিরচরিত নিয়মে ও বিধান অনুসারে বিবাহ প্রথা যুক্তি সঙ্গত নয়। বিয়ে-শাদী সাধারণত লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বিবাহ প্রথার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচলিত ছিল। আদিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব কালে স্ব-স্ব গোত্রের আচার অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে দ্বিতীয় শতকের দিকে বৃত্তের চট্টগ্রামের সংস্কৃতির লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাথমিক রূপ লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার লাভ চর্চার ফলে তার কিছুটা শিথিল হলেও এখানকার লোকজীবন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ধর্মীয় ইতিহাসে দেখা যায়, বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত দশটি উপদেশ বা বরঃ ১. ঘরের আগুন বাইরে নিও না ২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না ৩. যে দেয় তাকে দেবে ৪. যে দেয় না তাকেও দেবে ৫. যে দেয় বা দেয় না তাকেও দেবে ৬. সুখে বসবে ৭. সুখে আহার করবে ৮. সুখে শয়ন করবে ৯. অগ্নির পূজা করবে ১০. গৃহাগত দেবতার পূজা করবে।[১৭]

তৎকালে প্রদেয় এসব উপদেশ কল্যাণময়। তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে এ লৌকিক বিবাহ আচার অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম বিবাহ প্রথার ঘোর বিরোধিতা করেছে। আর বিবাহ প্রথার সাথে যে যৌতুক প্রথা প্রচলিত আছে তা মূলতঃ বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা নব বিধান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা অন্যান্য ধর্মের বিধান মতে, নারীরা পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের ভূ-সম্পত্তির বা টাকা পয়সার কিছু অংশের অংশীদার হয়ে থাকে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিধান ও নিয়ম অনুসারে নারীরা সমঅধিকার প্রাপ্ত হলেও বিবাহ প্রথায় নারীরা যেমন অবহেলিত তেমনি পিতামাতার সম্পত্তি ভোগের অংশীদার থেকেও বঞ্চিত। এর কারণে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী মেয়েদের বিয়ে শাদিতে প্রচুর পরিমানে যৌতুক প্রদান করতে হয় (সমাজে স্বীকৃত নয়)। কারণ তারা বিবাহিত হওয়ার পর পিতা-মাতার আর কোন সম্পত্তির অংশীদার বা দাবিদার করতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম মতে, এ লোক সংস্কৃতি ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের কোন বিধি-বিধান না থাকলেও যুগ যুগ ধরে এ বিবাহ ও যৌতুক প্রথার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে।

আবাহ-বিবাহ পরিণয়: পালি ত্রিপিটক শাস্ত্রে পুত্রের বিবাহ পরিণয় প্রথাকে আবাহ আর কন্যার বিবাহ পরিণয় প্রথাকে বিবাহ বলে। বিবাহ সামাজিক জীবনের বৃহত্তর এবং জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। বিবাহের আগে ছেলেকে একবার প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। সচরাচর প্রথমেই বরের পক্ষে কন্যা নির্বাচন করে। পাত্রের যোগ্যতা অনুযায়ী পাত্রী নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বৌদ্ধরা সমরক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন থেকে বিরত থাকে। সগোত্র এবং স্ববংশের মধ্যে বিবাহ না হওয়া প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি। তবে মামাতো বোনকে অনেকে গৌতম সিদ্ধার্থকে অনুসরণে বিয়ে করে থাকে। তাছাড়া পিসী, মাসী, পিসতুত ও মাসুতত বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় মাঝে মাঝে। উভয়পক্ষ ঠিকজী বা কোটি বিচার করে ফোটক আছে কিনা পরীক্ষা করে। এছাড়াও শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, ধনী দরিদ্র বিচার করা হয়। জন্ম মাসে, জোড় মাসে, বর্ষাব্রত অধিষ্ঠানের সময়, পৌষ মাসে, চৈত্র মাসে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, কার্তিক মাসে এবং মাতা পিতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিয়ে হয় না। বিয়ে শাদী অনুষ্ঠান মাসের শুভাশুভ ধারণা। যথা-

ফাগুণের বিয়ে আগুন
চৈত্রের বিয়ে হারুগা
জেঠের বিয়ে হেট
কার্তিকের বিয়ে হাতি
পউষের বিয়ে পুষ্করা।[১৮]

বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই সাত মাসে বিয়ে শাদী অনুষ্ঠিত হলে সে বউ স্বামী ও শ্বাশুর পরিবারের পক্ষে শুভ ও মঙ্গল জনক হয়। বিবাহ সাধারণত তিন রকমের (ক) বর গিয়ে কনের বাড়িতে বিয়ে করে আসাকে চলন্ত বিয়ে। (খ) কনেকে তার নিজ বাড়ী থেকে নিয়ে এসে বরের বাড়িতে বিবাহ করা কে বলা হয় নামন্ত বিয়ে (গ) বর বিয়ে করে অপুত্রক শ্বাশুর বাড়িতে চলে যাওয়াকে ঘরজামাই বিয়ে বলে। অনুষ্ঠান প্রস্তুতির সাথে সাথে চলে উৎসবের ঐতিহাসিক অহলা কেসেট বাজান, বিবাহের মনমাতানো সানাই, ঢোল বাদ্য, গান বাজনা ইত্যাদি। বিয়ে সম্পর্কীয় বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধরা যেসকল সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও লোককর্মগুলো অনুসরণ করে থাকে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে তোলে ধরা হলো–

১) পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ২) বউ জোড়লী বা অলংকার চড়ানী ৩) গদ গলানো ৪) লগ্ন আনা ৫) পানসল্লা ৬) বর-কনের তেলোয়াই দেয়া বা তেল চড়ানী ৭) বর কনের সোহাগ ধরা ৮) বউ নামানী ৯) হাইচধরা ১০) কনের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ১১) গৃহদেবতা পূজা ১২) সিধা দেওয়া ১৩) ঢোলবিদ্যা ও অনুসরণ সহ বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা, প্রদীপ পূজা ও ত্রিরত্ন বন্দনা ১৪) মঙ্গল সূত্র পাঠ ১৫) বিয়ে অনুষ্ঠান ১৬) বিয়ের মন্ত্র ১৭) সহমেলা ১৮) নব দম্পতি গোসল ১৯) নব দম্পতিকে গুরুজনের আশীর্বাদ গ্রহণ ১৮) বেয়াই ভাতা ও নদিন্যা ১৯) মাটি হোঁড়ানী (বরের প্রথম শ্বশুর বাড়ি গমন) ২০) ভিক্ষুদের পিন্ডদান ২১) ছোয়াইং তোলা ২২) বৌভাত খাওয়া ২৩) মাড়ি হোরানী ২৪) ন দিন্যা যাওয়া ২৫) ফিরাইন্যা ভাত ২৬) বারমাসে তের ফল বেয়ার ২৭) বেয়াই ভাতা ২৮) মঙ্গল ঘট ২৯) কলসির জল ভরান ৩০) বরকলা ৩১) বরকনের গায়ে হলুদ স্নান ৩২) ঘাটা ঘরা ৩৩) পানমিটা ৩৪) বরসজ্জা, কনে সজ্জা ৩৫) ডুলিধরা ৩৬) নতুন বধুকে ভাত তরকারী ও ধান দেখানো ৩৭) বর বধুর ফুল শয্যা ৩৮) নতুন জামাইর সালামী ৩৯) বউ দেখা ৪০) রং ও ফুট খেলা ৪১) ঢোলবাদ্য, মাইক, সানাই বাজনা ৪২) বর কনের পিতা-মাতার অনুমতি ৪৩) স্ত্রী পুরুষ স্বগ্রামী ও ভিন্নগ্রামীদেরকের সান্ধ্য ভোজ ৪৪) যৌতুক প্রথা ৪৫) বিবাহ আসরে মন্ত্রপাঠ[১৯] ইত্যাদি।

এবার বিবাহের দুটি ঐতিহাসিক বিশেষ উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত-

মঙ্গলঘট: বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজে মঙ্গলঘাট প্রথা প্রচলিত আছে। বাড়ীর প্রবেশ পথে শুভ লক্ষণের প্রতীক মঙ্ঘট স্থাপন করা হয়। বাড়ির প্রবেশ পথে দু পাশে দুটি কলাগাছ পুতে তার উপর বা গোড়ায় জল পুর্ণ কলসী স্থাপন করত: মুখে দুটি আম্রপল্লাব অশ্বথ বাঁশ মুরাঝী, বইল, মধুবাশের পাতা এবং কলা গাছেরডিক দিলে মঙ্গলঘট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি ডাবও দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ রফিক উদ্দীন বিরচিত জবল মুল্লক মনোরস কাব্যে তার উল্লেখ আছে দেখা যায়-

'কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুইপাশে
আম্রজল দিয়া তাতে রাখিয়ে হরিষে।'

বরণকুলা: বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিয়ে বা শুভ কাজে মাঙ্গলিক প্রতীক রূপে বরণ কুলা বা ডালার বহুল প্রচলিত আছে।[২০] এ প্রথা হিন্দু-মুসলিম সমাজেও প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের বরণ কুলার উপাদানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

উপকরণ বা দ্রব্য নাম	পরিমাণ	উপাদানের প্রতীক ধারণা
১) নতুন কুলা	১ খানি	কল্যাণ ও শান্তির প্রতীক
২) সাইল ধান	৫ পোয়া	খাদ্য মানুষের জীবন ধারণ ও ধন সম্পদ লাভের প্রতীক করে।
৩) দূর্বাঘাস	১ গুচ্ছ/গাছি	বংশ ধারা বৃদ্ধির প্রতীক

৪) কাঁচা কলা/পেয়ারা	৪/৫টি	সবুজ ফল, সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় জীবনধারণের প্রতীক।
৫) কাঁচা হলুদ	২/৩ টুকরা	সৌন্দর্যের প্রতীক।
৬) শিলা (ছোট পাথর)	১ টুকরা	শৌর্য-বীর্যের প্রতীক।
৭) ঘিলা	১টি	দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের প্রতীক।
৮) সরিষা তেলের মাটি সেজ দীপ	১টি	আলো অন্ধকার দূরীভূত করে। তাই এটি জ্ঞানের বা আশার প্রতীক।
৯) পানিপূর্ণ মাটির কর্তি	১টি	পানির অপর নাম জীবন। জীবনের পূর্ণতার প্রতীক।
১০) অশ্বথ পাতা	১ গুচ্ছ/থোকা	সবুজ পাতা মানুষের জীবনের চির তারুণ্য ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক।
১১) আমের পাতা	১ গুচ্ছ/থোকা	
১২) বাঁশ পাতা	১ গুচ্ছ/থোকা	
১৩) মুরাজী পাতা	১ গুচ্ছ/থোকা	
১৪) বৈইল পাতা	১ গুচ্ছ/থোকা	
১৫) কলা গাছের কচি ডিক	১টি	

সমাজ প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বৌদ্ধদের বিবাহ পদ্ধতির ও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজে ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। বৌদ্ধের মধ্যে বিবাহে যৌতুক প্রথা প্রচলিত হয়ে থাকে তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। তবে বর্তমান বৌদ্ধ সমাজে ছেলে-মেয়েদের ধর্মান্তর বিষয়টি অতীব প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বধর্মে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে পরধর্ম সংস্কৃতি গ্রহণ করছে। এ অশুভ প্রভাব ও সংস্কৃতিকে রোধ করতে হবে

শবসৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: সামাজিক কর্মের অন্যতম হল শবসৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। মৃত ব্যক্তির সৎকারে সব ধর্মের স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। বৌদ্ধধর্মে মৃত ব্যক্তির সৎকারে করাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলা হয়। বৌদ্ধরা এ অনুষ্ঠান সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির সংমিশ্রণে সম্পাদন করে থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মৃতদেহ সৎকার ব্যাপক আড়ম্বরপূর্ণভাবে করা হয়। সমাজে কোন সদস্যের বা মানুষের মৃত্যু হলে শবদেহ হলুদ ও সাবান দিয়ে উত্তম রূপে স্নান করে নেওয়া হয়। তারপর নববস্ত্র পরিধান করে সুগন্ধ, পুষ্প ও গন্ধ দ্রব্যাদি দিয়ে শবকে শুচি পবিত্র করে উন্মুক্ত খাটে কিংবা উন্নত শয্যায় সজ্জিত করা হয়। শবদেহ শ্মশানে নেওয়ার সময় ভিক্ষুসংঘের নিকট সকলে বসে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলাদি গ্রহণ করে অনিত্যতা বিষয়ক পালি সূত্র শ্রবণ করেন। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভিক্ষুসংঘ বলেন, 'ইমং মতকাবত্তং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দানং দেমা।' এ মন্ত্র তিনবার পাঠ করে সংঘদান করা হয়। ভিক্ষুগণ নিম্নোক্ত অনিত্য গাথা দেশনা করে থাকেন- "অনিচ্চা বত সংখারা উপ্পাদাবযধম্মিনো, উপ্পজিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো। সব্বে সত্তা মরিন্তী চ মরিংসু চ মরিস্সরে, তাতে ওযহাং মরিস্সামি নত্থি মে সংসযো।"[২১] অর্থাৎ "সমস্ত সংস্কারই অনিত্য। সবকিছুই উৎপত্তি ও ক্ষয়ধর্মী, উৎপন্ন হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এ সংস্কারসমূহের উপশমই সুখ অর্থাৎ পুনজন্ম না হলেই সুখ। সকল প্রাণীই মৃত্যুর অধীন, যারা জন্মেছে তারা মরেছে, মরবে এবং ভবিষ্যতেও মরবে; আমিও যে মৃত্যুবরণ করব তাতে কোনো সংশয় নেই।" মৃতদেহকে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে আলং বা শবাধার দিয়ে কীর্তন মাইক বাজনা, বাজি পোড়ান এবং আনন্দ উল্লাস করে শ্মশান খোলায় নিয়ে যাওয়া হয়। বৌদ্ধরা বয়স্ক ব্যক্তি নারীর শবকেদাহ (আগুন পুড়ানো) করা এবং শিশুদের কবর দিয়ে থাকে। দাহ করার সময় চিতাতে সাতবার প্রদক্ষিণ করে সাত বার অগ্নিসংযোগ করার পর অন্যান্যরা তাতে অংশ নেয়। বৌদ্ধদের শ্মশানে (দ্বিতীয়) নারীরা যেতে পারে না। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক বা কান্না করা বৌদ্ধ বিধান নেই। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সপ্তাহের দিন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান (সংঘদান) হয়। বৌদ্ধরা পুদগলিক দান কিংবা সংঘদান কিংবা অষ্টপরিষ্কার দান করে থাকে। ভিক্ষু শ্রামণকে দান দিয়ে যথাসাধ্য লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। ঐ দিন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সূর্যাস্তের পর ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘ মৃতের বাড়িতে এসে মঙ্গলসূত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'ফারিক শ্রবণ' বাড়ির চারিদিকে ফারিক সূতা দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক সংঘদানের পর হতে প্রথম বছর প্রতিমাসেই ভিক্ষু বা সংঘকে খাদ্য ভোজ্য ও দান দক্ষিণাসহ অনুরূপ দান দেওয়া হয়। সাধারণত অশুভ তিথি নক্ষত্রের দিনে পরলোক গত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ষম্মাসিক ও বার্ষিক শ্রাদ্ধার ছোয়াই, দেওয়া প্রথা প্রচলিত আছে। সংঘদান শেষে উত্তম খাদ্য, পানীয়, দীপ, ধূপ ইত্যাদি দ্বারা বাড়ির আঙ্গিনার বাহিরে একটি মাচার উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দান দেওয়া হয়। এটাকে বলা হয় 'প্রেত পূজা'।[২২]

মানৃত করা: প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানত করার প্রবণতা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। মানত একটা প্রতি পরিচিত সকলের চেনাজানা শব্দ। কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি খ্রীস্টান দেখা যায় বৌদ্ধদের মাঝেও মানত করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের সকলের বিশ্বাস যে তার দ্বারা মানুষের মঙ্গল হয়; সফলতা লাভ হয়। উল্লেখ্য যে, তাদের কোন কিছু কাজ কর্ম, লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, মনের ইচ্ছায় যদি সফল কাম হন তাহলে তারা কোন দরগা, মসজিদ, মন্দির সেবা খোলা বা চার রাস্তার

মাথায় গিয়ে গরু, ছাগল, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি মানতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেবেন। ঠিক তাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হলে মানত করা জিনিস সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। মানত করা আসলে বড়ুয়া বৌদ্ধদের এক ধরনের কুসংস্কার। এটা আসলে কাল্পনিক লৌকিকতা, কারণ এসব মানত করার পেছনে বাস্তবভিত্তিক চিন্তা ধারার কিছুই প্রতীয়মান হয় না। আমরা জানি বৌদ্ধরা যে সকল ক্রিয়াকর্ম করে আর পূজা পার্বণ করে তা শুধু বৌদ্ধধর্ম ভিত্তিক যুক্তিনির্ভর ও স্বয়ং বুদ্ধ নির্দেশিত। আর এ মানত করার প্রথা বা কর্মবাদী বৌদধর্মের শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নেই। তাই এ মানত করার প্রবণতা বাস্তবে লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।[২৩]

জীন-ভূত বা পরীতে পাওয়া: লোক সমাজের মধ্যে জ্ঞানভূত বা পরীতে জীনভূত বা পরীতে পাওয়ার কুসংস্কার প্রবণতাটি। প্রত্যেক মানুষ মনে করে থাকে যে রাতে বা ভর দুপুরে গাছ তলায় বা পুকুর পাড়ে গেলে মানুষের বা গর্ভবর্তী নারীরা যদি দিনে বা রাতে গেলে তাকে পরীতে পাবে, ভূতে পাবে। জীনে পাবে বা আচর লাগতে পারে এ নীতি বিশ্বাস করে। প্রত্যেক ধর্মে তার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রেক্ষাপটে যদি হঠাৎ যদি কেউ অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে দ্বায়ী কোন কিছু হয় তাহলে তাকে বলা হয়ে থাকে জীনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে, পরীতে পেয়েছে ইত্যাদি। আর তাকে ভাল বা সুস্থ করার জন্য প্রয়োজন হয় বৈদ্য, গাছা, ফকির, ভিক্ষু, মৌলভি ইত্যাদি। এই মিথ্যা ধারণা অধিকারী হয়ে প্রকৃত সত্য বাস্তবিকতায় বিশ্বাসী হতে হবে। তাহলে সমাজে আসতে পারে লৌকিকতা ও কুসংস্কার বর্জিত ধর্ম এবং মৌলিক জ্ঞান দর্শনচর্চার ধারা। বর্তমানে সমাজে এখনো এসব লৌকিকতা ভর করছে।

বাণ-টোনা-বৈদ্য ও ঝাড়ফুঁক: বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি ধর্মে বহুল ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে বাণ-টোনা, বৈদ্য ইত্যাদি কুসংস্কার ও লৌকিক কাজ কর্ম। লোক সমাজ বিশেষ করে বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট তা ওতোপোতো ভাবে জড়িত এবং বহুল জন সমাজে পরিচিত। বিশেষ করে মারমা, রাখাইন ও চাকমা বৌদ্ধরা সব সময় করে এবং করে আসছে। এ বাণটোনা ও বৈদ্য এর সম্পর্কে মানুষের লৌকিক ধারণা ও দুবর্লতা আছে। লোক সমাজের মন্তব্য ও ধারণার আলোকে কিছু বলা যায়-

কোন লোকের সাথে যদি কারো শক্রুতা থাকে তার বিনষ্ট বা ক্ষতি সাধন কিংবা অমঙ্গল অবনতি ইত্যাদি করার জন্য মিথ্যা কুসংস্কারের আশ্রয় নিয়ে করা বান টোনা। বান টোনা যে ফলদায় তা লোক মনে প্রচলিত থাকে। তার মনে করে-বাণ টোনা দ্বারা শক্রুদের ক্ষতি বা নষ্ট করতে পারে। এ বাণ টোনা করার অজ্ঞাত ধারণা প্রবল বিশ্বাস বিশেষ করে গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা বিদ্যমান। এর আবার আর একটি ব্যাপার হল বৈদ্য দ্বারা অশুভ বাণ টোনা থেকে রক্ষা পাওয়া। বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে এ ধরনের বৈদ্যের আনাগোনা দেখা যায়। তারা বলে বাণটোনা থেকে রক্ষা করতে পারবে, রোগের উন্নতি করে দিতে পারবে। এ ছাড়া বৈদ্যেরা কোন লোকের রোগ হলে, হারানো গেলো, মানুষের অমঙ্গল দেখা দিলে নানা বিষয় সম্পর্কে হুবহু বলে দিতে পারে। এরা আবার ভালো করার জন্য নানান কথা বলে থাকে। বৈদ্যরা বাণটোনা কেটে রোগ ভালো করার জন্য যা যা বলেন। প্রথমে কি হয়েছে দেখার জন্য নিবে কিছু টাকা, তার পরিমান এ ধরনের-১.২৫, ৩.২৫, ৫.৫০ ইত্যাদি হারে। রোগ নির্ণয় করে পরে যা উপকরণ প্রয়োজন হয় কলার মোয়া, কচি ডাব, মোমবাতি, ধূপকাটি, কলা, মরিচ, পেয়াজ, রসুন, আদা .৫০ অথবা ১ কেজি, ১ ছটাক ভালো সরিষার তৈল, কদু বা লাউ, বাড়ির কোণের শন ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা রোগের জন্য নানা উপকরণ দিয়ে থাকেন বা বলে থাকেন বৈদ্য। আর শরীরের সাথে দেওয়া হবে তার কাল্পনিক তৈরি দামী (২০০-১০০০ টাকা) তাবিজ যাতে অপদেবতা বা শক্র তাকে কোন ক্ষতি করতে না পারে, যেন কোন অবনতি বা অমঙ্গল না হয়। যুগে যুগে কুসংস্কারে বশবর্তী হয়ে তা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে। এসব কিছু কৌশল অবলম্বন প্রতারণা বা লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এমন কোন শাস্ত্রে অনুসরণ করার জন্য বলা হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধরা তা করে বস্তুত লৌকিকতার আশ্রয়ে যার কোন বাস্তব বা মৌলিক ভিত্তি নেই। বৈদ্যরা সহজ সরল অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মানুষের কাছে ভ্রামীর আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা করে থাকে। সে কৌশল অবলম্বন করে থাকে একজন তুলারাশি জাতকের লোক ঠিক করে গাছা বসায়। তার আসন তাকে দক্ষিণ বা পূর্বমুখী যার কেমন ইচ্ছা তেমনি বসায়। বসার আসনে থাকে মঙ্গলঘট, এতে মন্ত্রপূত পানি নিয়ে গাছার মুখে ও মাথায় ছিটিয়ে দেয়, কাসা বাজায়, ধূপ জ্বালায়, বৈদ্য ভাল (বৈদ্যের মাকে অর্থাৎ লোক দেবীকে আবাহন করার জন্য পান) গেয়ে থাকে। যেমন-

আইজ রে মা-মাঘিনী মইঘ্যা রাজার ঝি
আইয় তুই সোনার নাধং কানত দি
তোয়ার জয়গান গাইতে মাগো আর জনম যায়
মগধেশ্বরী মারে মা শ্রীঘ্র দেখা দেঅ
তোয়ার আসন সজায়ইয়াছি বড় আশা করে
তুমি মাতা দিষ্টি দেঅ এই গাছার উ অরে
তোয়ার জলি দিয়ম মাগো শনি মঙ্গলবারে

তুমি মাতা কিরপা করঅ এই রোগীর উঅরে ।[২৪]

ইত্যাদি বলে থাকে ছলনা বশে। সার্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে সম্যক সত্য ও মঙ্গলময় বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে।

মাংস ভক্ষণঃ

মাংস খাওয়া সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বুদ্ধের পঞ্চনীতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যাক। পঞ্চশীল হল- প্রাণীহত্যা থেকে বিরত, অদত্ত বস্তুগ্রহণ (চুরি) হতে বিরত, মিথ্যাবাক্য হতে বিরত, অবৈধকামাচার হতে বিরত, সুরা-মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা। আমরা বুদ্ধের প্রচারিত মতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ ও পালন করে থাকি। বুদ্ধ সবসময় উপদেশ দিয়েছেন প্রাণী বধ বা হত্যা থেকে বিরত থাকিও। অর্থাৎ অকারণে প্রাণী বধ না করা। মানুষকে চিরাচরিত নিয়মে কিছু না কিছু অবলম্বন করতে হয়। এ ভবচক্র একটার উপর একটা নির্ভরশীল। বুদ্ধের কার্যকারণতত্ত্ব হলো কোনটি বাদ দিয়ে মানুষের জীবন চলে না। কিন্তু জীবন ধারণের তাগিদে মানুষকে কোন না কোন অবলম্ব মেনে নিতে হয়।

সমাজে আরো প্রচলিত আছে যে, বড়ুয়া বৌদ্ধদের গরু, মহিষের মাংস খাওয়া যাবে না। আর প্রচলিত আছে যে, বাঙালি বড়ুয়া ও পার্বত্য অঞ্চলের বৌদ্ধদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য শুকর। কি করে তা হতে পারে সবইতো প্রাণী খেতে হলে বধ করে খেতে হবে। এটা একটি লৌকিক বা কাল্পনিক লোকাচার? বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ এর পূর্বে প্রধান সেবক আনন্দকে বলেছিলেন যে, আনন্দ দশ প্রকার প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা নিষেধ। সেই দশ প্রকার প্রাণী কি কি? যথা : মানুষের মাংস, ব্যঘ্র মাংস, দীপিকার মাংস (বিড়াল), সিংহের মাংস, কুকুরের মাংস, অশ্বের মাংস, হস্তির মাংস, নেকড়ে বাঘের মাংস, ভল্লুকের মাংস এবং সর্পের মাংস বুদ্ধের মতে অখাদ্য। আবার বুদ্ধ পরিনির্বাণ কালে আনন্দকে দুই প্রকার পিণ্ডপাত সমান ও সমফলপ্রদ দায়ক, সমান বিপাক দায়ক বিশিষ্ট অর্থাৎ অতীব ফলপ্রদ ও মহাপুণ্যপ্রদ বলে ভাষণ করেন- ১. সুজাতার পায়সান্ন ও ২. স্বর্ণকার চুন্দের শুকর মদ্দব (মাংস)।[২৫]

আর ভগবান বুদ্ধের বিনয় নীতি ও উপদেশাবলীর মধ্যে মাংস না খাওয়ার সম্পর্কে বিধি নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধরা মাংস ভক্ষণ করা মহাপাপ বলে মনে করেন আসলে তা সঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধরা মিথ্যা ধারণা ও লৌকিকতার আশ্রয়ে আদৃত হয়ে মাংস ভক্ষণ করে না। বড়ুয়া বৌদ্ধরা বিভিন্ন মাছ, মাংস তথা মুরগী, শুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর মাংস অনায়াসে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর গরু, মহিষ, ছাগল এর মাংস না খাওয়ার ফতোয়া সামাজিক লোকাচার কিংবা লৌকিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত পক্ষে বড় প্রাণী কারণে বধ না করা এবং নিরামিষযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার বিষয়ে বুদ্ধ সব সময় উপদেশ দিয়েছেন। তাই বুদ্ধ পাঁচ প্রকার বাণিজ্যকে নিষেধ করেছেন-প্রাণী, মাংস, অস্ত্র, মদ, বিষ বাণিজ্য। বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল একথা সত্য। কিন্তু আজও হিন্দুদের আচার, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির লৌকিক প্রথা ও মৌখিক পরম্পরাগুলো বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সংস্কৃতি, লোকাচার, কৃষ্টি ও পূজা-অর্চনা আজো প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি।

হলকর্ষণ উৎসব (আল্পলানি):

বাঙালি বৌদ্ধরা অতীতকাল থেকে কৃষি নির্ভর জীবন-যাপন করতে দেখা যায়। বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবসা ও চাকরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাঙালি বৌদ্ধরা কৃষি চাষ করার পূর্বে একটি বিশেষ উৎসব বা পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। এই উৎসবকে বলা হয় আল্পলানি বা অম্বুবাচী। একে হালপলানী পূজাও বলা হয়।[২৬] বৌদ্ধদের সামাজিক এ লৌকিক ক্রিয়াকলাপকে অনেক অনেক ভাবে বলে থাকে। হিন্দুরা বলে আম্বুবাচীরদিন বড়ুয়া চাকমারা বলে আল্পলানি। প্রচলিত আছে যে, চাষাবাদ করার আগে আল্পলানি নামক উৎসব বা পূজা করতে হয়। যদি এ আল্পলানি না করে তাহলে জমিতে ফসল হবে না। বড়ুয়াদের যেহেতু কৃষি প্রধান পেশা সেহেতু তারা এ আল্পলানিকে প্রচন্ড ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে পূজা-পার্বণ করে থাকে। যাতে ফসল অধিক হারে জন্মায়। প্রকৃত পক্ষে বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে এটা লৌকিক প্রথা। তারা মিথ্যার বশবর্তী হয়ে এ পূজা করে থাকে। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ দিন ধরিত্রী রাজস্বল হন।

আল্পলানির দিন বিশেষ খাদ্য তৈরি করা হয়। এ খাদ্য দ্রব্যগুলো লোকজনকে বিতরণ করে থাকে। তৈরিকৃত সামগ্রীর কিছু অংশ (কাঁঠাল, আম, সুজি, ভাত ও পিটা) চাষের জমিতে গিয়ে সকলকে প্রদান করে থাকে। আর সকলে এসব খাদ্য খেতে খেতে হৈ, হৈল্লা ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা দেবতাকে পূজা করে থাকে। এটা আসলে এক ধরনের কুসংস্কার। কুসংস্কারের (Superstition) বেড়াজালে বৌদ্ধরা আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা সবাই। এই কুসংস্কার প্রথা আমাদের সমাজ ও ধর্মকে পদে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কবি সুইফট বলেছেন, ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামী, দারিদ্রকে আরো দারিদ্র করে তোলে। এতদ্সত্ত্বেও ধর্ম মানুষ যা ভালো মনে করেছে তাকে দিয়েছে প্রচণ্ড সমর্থন, বলবৎ করেছে অবশ্য পালনীয় বিষয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য যা উপকারী ধর্মতাকে অনুমোদন দিয়েছেন দ্বিধাহীন ভাবে। আর পৃথিবীকে ধর্ম মানুষকে সন্দেহ মুক্ত করেছে সাহস যোগিয়েছে। মেলিনোতস্কির মতে, ধর্ম সমাজে সংহতির স্তম্ভ স্বরূপ। তিনি তাঁর Magic, Secince and Religon (নিউইর্য়ক ১৯৫৪) নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান মানুষকে হতাশা ভয় ও চরম নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করেছে। ব্যাডক্লিক ব্রাউন তার Structure and Function in Primitive

Society (লন্ডন ১৯৫২) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, কিভাবে ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতিকে রক্ষা করে, মানুষের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছে। ধর্ম যদি ব্যক্তি চরিত্র, বিশ্বাস, বিশুদ্ধ সংহতি, সামাজিক সমঝোতা, রক্ষা না করতো, তাহলে মানব সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। মানব সমাজের ধর্মের পূজা পার্বণের সমাজ সংস্কৃতি, আদি ঐতিহ্য জীবনের সঙ্গে তা গভীরভাবে সম্পৃক্ত জীবনের সকল পর্যায়ে তা আজ মজ্জা প্রোথিত জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিব্যাপ্ত।

একথা সত্য যে, শত কুসংস্কার শত অপসংস্কৃতি শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণ এবং সামাজিক রীতিনীতি ও লোকসংস্কৃতি মানুষকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাই বর্তমান এ প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব ও অসংস্কৃতির শেকড় যতই গভীরে হোক না কেন, সকলের ঐকান্তিক স্বতঃস্ফুর্ত সচেতনার মাধ্যমে এ থেকেই যুক্ত হওয়া সম্ভব। বর্তমানে মানবতা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি, হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর সমস্ত অশুভ সংস্কৃতি ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা পরিহার করে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে সৃজনশীল আধুনিক সমাজ, দেশ ও জাতি বিনির্মাণ করা সম্ভব।

চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈসাবি উৎসবঃ

বিশাখা নক্ষত্রের বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধলাভ ও মহাপরিনির্বাণ তিথি। এ তিথিতে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তি ও বিজু (বৈসাবি) উৎসব সমতলীয় বড়ুয়া ও আদিবাসী বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে জাতীয়ভিত্তিক বৈসাবি বৃহৎ উৎসব। আদিবাসীরা চৈত্র মাসের শেষে দুই দিন চৈত্র সংক্রান্তি এবং নববর্ষের দিনে তিন পার্বত্য জেলায় এই বৈসাবি উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। এ উৎসব সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। টিপারারা (ত্রিপুরা) 'বৈসুক', মারমারা 'সাংগ্রাই', চাকমারা বিঝু উৎসব (বিহু), তনচংগ্যারা 'বিষু', খিয়াংরা 'সাংলান', ম্রোরা 'সাংক্রান' নামে অভিহিত করে থাকে। নামের ভিন্নতা থাকলেও তিনটি দিনকে ঘিরে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহৎ তিন জাতিগোষ্ঠীর উৎসবে যৌথ সমন্বয়ে সম্মিলিতভাবে বর্তমানে 'বৈসাবি' উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক লোকজ উৎসব 'বৈসাবি' হয়ে উঠেছে সব জাতি, গোষ্ঠীর মিলন মেলায়। প্রধান তিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসবের আদ্যক্ষরের মিলনে বৈসাবি (চকমা-বিজু, মারমা-সাংগ্রাই, ত্রিপুরা-বৈসুক) নামের সৃষ্টি। আদিবাসিদের বৈসাবি উৎসব পার্বত্যবাসী সব জাতির প্রাণের উৎসবে রূপ নিয়েছে।[২৭]

পহেলা বৈশাখে এই উৎসব পালন করা হয়। এটি মূলত বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণের নববর্ষ উৎসব। কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'সাংগ্রেং' (চৈত্র সংক্রান্তি) নামে নববর্ষ ও জলকেলি উৎসব নামে পালন করে থাকে।[২৮] এটি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং পটুয়াখালী ও বরগুণার আদিবাসী বৌদ্ধদের একটি ঐতিহ্যবাহী আনন্দময় উৎসব। বর্তমানে এ উৎসবকে চট্টগ্রামের সমতলীয় বৌদ্ধরা পার্বণ, চৈত্রসংক্রান্তি ও শুভ নববর্ষ হিসেবে অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। এসময় সমতলী বাঙালি বৌদ্ধরা নতুন দিনের আনন্দ-উদ্দীপনায় নানারকম পিঠাপুলি, খই, নাড়ু, জিরা ও নববর্ষের বিভিন্ন খাদ্য তৈরি করে। পাশাপাশি ঝাঁকপুড়া, চৈতঘাড়া নির্মাণ, ভোরে বিশেষ ফলের নির্যাস দিয়ে মঙ্গল স্নাস করে। একপ্রকার বিশেষ ফুল দিয়ে (বিউফুল) বাড়ির আঙ্গিনা ঘরবাড়ি সজ্জিত করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং সামাজিক লোকসংস্কৃতির রীতি হিসেবে পালন করা হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা নদীতে ফুল দিয়ে নদী দেবতার পূজা, বিহারে বিশেষ জলক্রিড়ার আয়োজন করে থাকেন। সবশেষে সন্ধ্যায় সকলে বিহারে গিয়ে ধর্মীয় উপাসনায় মিলিত হন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকলে বিশ্বাস করে থাকেন যে এই চৈত্র সংক্রান্তি উৎসবের মাধ্যমে বুদ্ধমূর্তি স্নান, গুরুজনদের প্রণাম ও শ্রদ্ধা, পুরাতন দোষ-ক্রুটি পাপসমূহ ধুঁয়ে মুছে নতুন বছর শুরু হয় আমাদের সকলের জীবনে।[২৯]

আদিবাসী ঐতিহ্যে দেখা যায়, চৈত্রের শেষ দিনটির আগের দিনটি 'বিজু ফুল'। চাকমা সম্প্রাদায়ের ফুলবিজু, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের হারিবিজু ও মারমা সম্প্রদায়ের আক্যাই। তরুণ-তরুণ শিশু-কিশোর পাতায় করে নাকসা, কুরুক, বাঁশজরা, খুসপাই, গোই, সবরক, মৌনি, বেবেক, তুরিং (ফুলের স্থানীয় নাম) ফুল সাজিয়ে নিয়েছে। গাঙ্গ দেবতাকে প্রণাম করে, প্রার্থনার পর ভাসিয়ে দেয় সেই ফুল। এরপর ঘর সাজানোর পালা। নিমপাতা-ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়। সেই সঙ্গে পরের দিনে মূল বিজুর প্রস্তুতি পর্ব। বিকেলে কিয়ংয়ে (বৌদ্ধ বিহার) গিয়ে বুদ্ধ বন্দনা, ফুল পূজা, প্রার্থনার পর শুরু হয় ঘরের আঙিনা, নদীর পাড়, ধানের গোলা, গোয়ালঘরে প্রদীপ জ্বালানো। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো জড়িয়ে যায় গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে।[৩০]

তরুণ-তরুণীরা দলবেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বয়স্কদের প্রণাম ও স্নান করায়। সেই সময় একজনের হাতে 'মং' বাজতে থাকে। মংয়ের ঢংঢং শব্দের সঙ্গে চলে স্নান পর্ব। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেয় নতুন প্রজন্ম। বাড়ি বাড়ি শুরু হয় পাচন (পাচন রান্না হয় ২৫ থেকে ৩০ পদের সবজি দিয়ে) বড়া পিঠা, ছাইন্না পিঠা, মারমা পিঠা, হুগা পিঠা, কলা পিঠা, পায়েসসহ নানা ধরনের খাবারের আয়োজন। বিভিন্ন ধরনের ফলমূলসহ অতিথিদের এই খাবারে আপ্যায়ন করা হয়। পুরোনো বছরের দুঃখ-কষ্টকে মুছে ফেলা হয় জল ছিটানোর মধ্যে দিয়ে। হতাশা–গানি ভুলে নতুন বছরকে এভাবে আপন করে নিচ্ছে পার্বত্যবাসী মারমা সম্প্রদায়। চাকমা সম্প্রদায় এ দিনটিকে বলে গজ্যাপজ্জ্য দিন অর্থাৎ গড়াগড়ির দিন। এ দিনে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে জগতের সব প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা হয়। সেই সঙ্গে চলে পালাগান, নাটক, গড়াইয়া নৃত্য, প্রদীপ নৃত্য, জুম নৃত্য,

বোতল নৃত্য, পরী নৃত্যসহ নিজ নিজ গোত্রের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আয়োজন। উৎসবের উল্লেখযোগ্য দিক হলো মারমা তরুণ-তরুণীদের পানি খেলা, চাকমাদের ঘিলা খেলা ও নাদেং খেলা এবং ত্রিপুরাদের 'গরিয়া নৃত্য'।[৩১] উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ আমলে 'চৈত্র সংক্রান্তি' উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় এক মাস এবং অফিস আদালতে দশ দিন ছুটি থাকত। পাকিস্তান আমলে এ ছুটি কমিয়ে দুই দিন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আমলে এসে তা একদিন করা হয়, যা ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে বিবেচিত হয়।[৩২] পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান সামাজিক উৎসব আনন্দমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপন করতে চৈত্র মাসের শেষ দু'দিন এবং নববর্ষের প্রথম দুদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা বৌদ্ধদের দীর্ঘদিনে দাবি।

ব্যূহচক্র বা স্বর্গপুরী উৎসব ও মেলা:

ব্যূহচক্র মেলা চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধদের অত্যন্ত প্রাচীন এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এটি মূলত সংসার চক্রের একটি গোলকধাঁধাঁ বিশেষ। এই সংসার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধদের এই ব্যূহচক্রও মনে হয় সংসার চক্রের রূপক হিসেবেই কল্পিত হয়েছে। ব্যূহচক্র অর্থ চক্রাকারে আবিষ্ট জাল। যার মধ্যে গমন ও প্রস্থান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বৌদ্ধদৃষ্টিতে এই ব্যূহচক্র মেলার আয়োজন করে থাকে। বৌদ্ধমেলা বা উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে বা পরিবাসব্রত উপলক্ষে এই ব্যূহচক্র কিংবা স্বর্গপুরী তৈরি করা হয়। বাঁশের ঘেরা দিয়ে খুব কৌশলে বিস্তৃত ভূখণ্ডে ব্যূহচক্র বা স্বর্গপুরী তৈরি করা হয়। প্রবেশ পথ থেকে ব্যূহচক্রের আঁকাবাঁকা বিভিন্ন মুখী রাস্তা দিয়ে কেন্দ্রে পৌঁছতে হয়। কেন্দ্রে থাকে মঞ্চের উপর বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধরা এই ব্যূহচক্রকে সংসার চক্রের সাথে তুলনা করে থাকে। সংসার চক্রের প্রতীক ব্যূহচক্র। বৌদ্ধ মতে, সংসার চক্রে কার্যকারণ তত্ত্বে কিংবা দ্বাদশ নিদান তত্ত্বে মানুষ প্রতিনিয়ত ঘুরছে। সংসার দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান প্রতীকি রূপে এ মেলা।

সাধারণত কার্তিক আগ্রহায়ণ মাসে এই মেলা হয় চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে। স্বর্গপুরী বা ব্যূহচক্র একটি গোলক ধাধা বিশেষ। একবার ঢুকলে লক্ষ্যস্থলে যাওয়া যেমন কঠিন আবার বের হয়ে আসাও কঠিন। এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে বাঁশের ঘেরা দিয়ে আঁকাবাঁকা করে এবং মাঝে দু'মুখী, তিনমুখী এবং চতুমুখী রাস্তা করে ব্যূহচক্র করা হয়। ঠিক মাঝখানে থাকে বুদ্ধমূর্তি। যারা ঠিক ঠিক পৌঁছতে পারে তারা ফুল ও প্রদীপাদি দিয়ে বুদ্ধপূজা করে আবার ফিরে আসে। কিন্তু শেষপর্যন্ত লক্ষ্যস্থল পৌঁছতে পারে খুব কম ব্যক্তিই। ব্যূহচক্র সংসারারণ্যের প্রতীক মাত্র। ব্যূহচক্রের ন্যায় মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে সংসারে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করেও মুক্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ করলে মানুষ জীবনে মুক্তি লাভ করতে পারে এটা বুঝানোর জন্যই ব্যূহচক্র মেলার আয়োজন করা হয়।[৩৩]

লোকসংস্কৃতি হিসেবে বৌদ্ধরা প্রতিবছর বুহ্যচক্র বা সংসার চক্র মেলা আয়োজন করেন। অর্থাৎ এই মেলার মাধ্যমে তারা বাস্তবিক বুদ্ধের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের মাঝে ফুটিয়ে তোলে। বিশেষকরে মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, এই মহালোকভূমিতে আমরা অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করি। কখনো মানুষ, কখনো বা দেব-ব্রহ্মা বা তির্যক প্রাণী হয়ে অনেক সময় নরকেও গমণ করি। সেই পুনঃজন্ম শিক্ষাকে ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষার জন্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা এই বুহ্যচক্র মেলার আয়োজন করে থাকে। এখানে কার্যকারণ তত্ত্ব তথা একটি কল্পিত ৩১ লোকভূমি তৈরি করে সেখানে চক্রাকারে রাস্তা ও ঘর তৈরি করা হয়। মাঝে মাঝে স্বর্গের কনক বিমান ও অন্যান্য বিহার ও চৈত্য তৈরি করে সেখানে সকলে ঘুরে ঘুরে ভবচক্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে।

বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায় এবং চট্টগ্রামের পটিয়া, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি এবং কক্সবাজার জেলার রম্যভূমি রামুর মেরেংলোয়া, রাজার কুল, হাজারীকুল, শ্রীকুল, অষ্টকাটা গ্রামে এবং উখিয়া, পালং, কক্সবাজার সদর ও চকরিয়ায় প্রতিবছর ব্যূহচক্র মেলা ও স্বর্গপুরী অনুষ্ঠিত হয়। একে আঞ্চলিক ভাষার প্যাঁচঘরও বলা হয়।[৩৪]

জাদি উৎসব:

পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলায় বড়ুয়া বৌদ্ধ ও রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ জাদি। যা এ অঞ্চলের এক মহামূল্যবান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপত্য সম্পদ এবং নন্দন সংস্কৃতির উৎসব। কক্সবাজার জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে কতুবদিয়া ছাড়া অবশিষ্ট ৬টি উপজেলায় জাদি রয়েছে। প্রতিটি জাদি বিহারকে কেন্দ্র করে পূর্ণিমা তিথি বা স্মরণী দিনে ধর্মীয় উৎসব ও মেলা হয়। কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া ও উখিয়া টেকনাফে বিশেষ করে জাদি উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয়। প্রাচীনকালে এসব অঞ্চল ছিল আরাকান বৌদ্ধ রাজা শাসিত রাজ্য। এসব প্রাচীন জাদিগুলো সর্ব প্রথম কখন নিমার্ণ হয় এবং কখন থেকে জাদি উৎসব বাংলাদেশে প্রচলন হয় তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। তবে ইতিহাস থেকে অনুমান করা হয় তৎকালীন সপ্তদশ শতাব্দী হতে আরাকান রাজ শ্রী সুধর্মার সময় কালে জাদি নির্মাণ ও উৎসব প্রচলিত হয়েছিল। কক্সবাজার কাছারী পাহাড় তথা কোর্ট বিল্ডিং এলাকা এবং রামু রাজার কূল পাহাড়ে প্রাচীন জাদি ছিল। সম্ভবত ১৮০০ সালে ব্যাপকভাবে বড়ুয়া বৌদ্ধ ও রাখাইনরা এদেশে এসব জাদি নির্মাণ ও উৎসবের আয়োজন করে থাকে।[৩৫]

কক্সবাজার জেলার অনুরূপ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলা এবং পটুয়াখালী ও বরগুণায় জাদি রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশের অধিক জাদি রয়েছে। জাতি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে পাহাড় চূড়ায় জাদি ও বিহারের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিবেশী বৌদ্ধরাষ্ট্র মায়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনের ঐতিহাসিক গোল্ডেন প্যাগোড়া (The great shwe Dagon Pagoda) বিশ্ব জাদি। চৈত্য শব্দ থেকে জাদি শব্দের উদ্ভব হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এ ধরনের চৈত্য নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম সম্রাট অশোক। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সম্রাট অশোক ৮৪ হাজার চৈত্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকাশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যগুলির গুরুত্ব ও অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। আড়াই হাজার বছরের বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা সংস্কার এদেশের গৌরবময় সংস্কৃতির অধ্যায় ও ইতিহাসের বৈচিত্র্যতায় সংসযোজন।

লোক সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যবাহী মাঁন (টেটো):

মাঁন বা টেটো করা আদিবাসী ও বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে চাকমা, মারমা ও রাখাইনরা ঐতিহ্যগতভাবে শরীরে বিশেষ করে বাহু ও পায়ের নিম্নাংশে শুই দিয়ে লাল রং এর এক ধরণের তরল পদার্থ ফোটা ফোটা করে চামড়ার নীচে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে থাকে এটিকে তারা মাঁন (Mhin) বলে তাকে। লোক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ভান্তে/ভিক্ষু/ধর্মীয় পুরোহিতেরা বিশেষ মন্ত্র পাঠ করে লোক ঔষধ/অশুভ আক্রমন থেকে শরীর বন্ধক/ব্রত হিসেবে হাজার বছর ধরে বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। মূলত এটি তন্ত্র-মন্ত্র, যাদু, বান, টোনা থেকে রক্ষামূলক প্রাকৃতিক লোক ঔষধ। প্রাচীনকাল থেকে জনগোষ্ঠীর মানুষের মাঝে লোকবিশ্বাস ছিল বৈদ্য বা যাদুককরা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যগুণ করে তন্ত্র-মন্ত্র, বান টোনার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করতে পারতো। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে চাকমা, মারমা, রাখাইনরা সম্প্রদায়গত ভাবে এইলোক সংস্কৃতিক জ্ঞান অর্জন করে। এটিকে তারা মাঁন বলেছেন। রাখাইনরা মনে করেন মাঁন মারার বা নেয়ার অর্থ হচ্ছে- ন্যায় ও সরল জীবনযাপন ব্রতি হওয়া। মৌলিক অর্থে এ ঐতিহ্যবাহী লোক জ্ঞানটি রাখাইনদের মূর্ত লোক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি।[৩৬]

এই রাখাইনরা লোকসংস্কৃতির ঐতিহবাহী এ মাঁন মারার পদ্ধতি, মাঁন গ্রহণের তিনটি ব্রত পালন, মাঁন এর প্রকার ভেদ, মাঁন মারার ৯টি মন্ত্র ও স্পর্ট, মাঁন মারার উপকারিতা, মাঁন এর শিল্প মূল্যমান, মাঁন মারার অধিকার, মাঁন এর গতি, মেধাসত্ত্ব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাখাইন ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতির এ মাঁন লোক জ্ঞান ও মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণ, মূল্যমান নির্ধারণ ঐতিহ্যর স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজন।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে, বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির রূপ-রূপায়নে চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ জাতিসত্তার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় সামাজিক বিভিন্ন প্রথা, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরার প্রভাব অত্যন্ত সৌষ্ঠব। ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে প্রচলিত রয়েছে অনেক লোকবিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা ও শিল্প-বিনোদনে বিদ্যমান। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও মিশনারীর প্রভাব থেকে বৌদ্ধদের জীবন-জীবিকা, আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষা প্রয়োজন। কারণ–

প্রথমত: বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেকের বেশির বসবাস চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও প্রত্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাদের মধ্যে অভিন্ন সঠিক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি চর্চায় সমন্বয় আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশ স্বাধীনের পর বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিরূপ প্রভাব বৌদ্ধদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে সামাজিক লোকাচার ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে।

তৃতীয়ত: বৌদ্ধ জাতিসত্তার ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের মধ্যে শুদ্ধ সাংস্কৃতিক ও নান্দনিকবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন।

চতুর্থত: বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ভাষাতাত্ত্বিক, জীবনধারা, সমাজপ্রথা, লোকসংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাসে অন্যদের ব্যাপক প্রভাব। ফলে সামাজিক লোকসংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় লৌকিকতা বিদ্যমান।

পঞ্চমত: বৌদ্ধ জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মানবাধিকার লজ্ঞন এবং ভূমি বিরোধসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। তাই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগ প্রয়োজন।

ষষ্ঠত: সমতলী বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচার, সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য বৌদ্ধ পল্লী ও পাহাড়ের নির্জন অরণ্যে বিহার, চৈত্য, ধ্যানকুটির, ধর্মীয় পুস্তক ও ত্রিপিটক প্রকাশ এবং স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা ও পালি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি।

সপ্তমত: বিহার-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন, প্রকৃত ধর্মচর্চা, বৌদ্ধসংস্কৃতিচর্চা ও প্রসার, স্বধর্মের প্রতি আনুগত্য, স্বজাত্যবোধ সর্বোপরি দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বৌদ্ধ জনপদে ক্রমাগত বড়ুয়া বৌদ্ধ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসরমান হলেও গ্রামের অধিকাংশই বৌদ্ধরাই সহায়-সম্বলহীন ও ভূমিহীন হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা প্রথাসমূহ ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে বহু পুরানো সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। ইতিহাস মতে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মগধের চন্দ্রসূর্য আরাকানসহ চট্টগ্রামে রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নতুন বৌদ্ধ সংস্কৃতির যোগ হয়। বাঙালির ইতিহাস মতে, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী হলো বৌদ্ধধর্মের অন্ধকার যুগ। এসময়ে বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সভ্যতা, লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরা অনেক সংস্কার অন্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রচলিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি-নীতি ও সামাজিক আচার-সংস্কৃতি চর্চার সূচনা হয়। ১৮৬৪ সালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের অগ্রদূত প্রথম সংঘরাজ সারমেধ মহাথের বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতি সংস্কারে এগিয়ে আসেন। ধর্মীয় রীতিতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান, বিনয়সম্মত নিয়ম-নীতি এবং সামাজিক লোকাচার, সংস্কৃতি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে বিশুদ্ধ রীতিতে চর্চার ধারা প্রতিষ্ঠা হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষায় যতই উন্নত হবে ততই প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কৃতি ও প্রথা অনুষ্ঠান প্রতিপালনে সচেতন হবে। কারণ ধর্মীয় ও সামাজিক লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি জনজীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় চর্যার অবলম্বন। কেননা মানুষের ধীশক্তি, চিন্তা, অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-বিনোদন ও চর্যাবোধ স্বীয় সংস্কৃতিতেই পর্যায়ক্রমিক প্রভাবিত হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে বিনয় শাস্ত্রীয় বিধান থাকলেও বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি ও লৌকিকতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমনকি চর্যার ভিত্তিমূলে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে আছে। বর্তমানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বিদ্যমান লোকসংস্কৃতি ও মৌখিক পরম্পরার প্রভাবে প্রকৃত জীবনাচার, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পসংস্কৃতি, বিনয় সম্মত প্রথা, নিয়ম-নীতি ও আদর্শ প্রতিপালনে ভিন্নতা ঘটছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রচলিত লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ ও আচার অনুষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকার সাধন করে বৌদ্ধ বিনয়সম্মত আদর্শ সমাজ গঠন করা অত্যাবশ্যক।

তথ্যসূত্র:

---

[১] চৌধুরী, আবদুল হক। কক্সবাজার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি। ১৯৮৪, চট্টগ্রাম, পৃ. ৮৩।

[২] রায়, শ্রীশরৎ কুমার। বৌদ্ধ ভারত। করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৬৫।

[৩] শরীফ, আহমদ। প্রচ্ছন্ন, বৌদ্ধ সাহিত্য। সাহিত্য পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

[৪] মহাথের, অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত। অলৌকিক নয় তবুও লৌকিক (প্রবন্ধ)। স্মরণিকা, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪৫।

[৫] বড়ুয়া, জগন্নাথ। বৌদ্ধ মেলার প্রাচীন ইতিহাস (প্রবন্ধ)। বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা,৩১-৩২ (২০০৮-২০০৯), বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এপ্রিল ২০১০

[৬] Samarawickrama, Vijaya, A Buddhist Reflects on Spirituality, Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society, Buddhist Maha Vihara, Kuala Lumpur, March 2023, Malaysia, P. 21.

[৭] ভিক্ষু, সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভাস্কর্য, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৮-১৯।

[৮] চৌধুরী, ড. সুকোমল, বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৭৬।

[৯] Eliiot, Sir Charles, Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, vol. 1, Routledge & kegan Publication, 1987, London, p. 45.

[১০] Barua, Dr. Dilip Kumar & Ando, Dr. Mitsaru, Syncretism in Bangladesh Buddhism, Nagoya, 2002, Japan, p. 121.

[১১] মহাস্থবির, ভদন্ত জিনবংশ। সদ্ধর্ম রত্ন চৈত্য। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, চট্টগ্রাম, পৃ. ২৫৪/ স্থবির, শ্রী ধর্মতিলক। সদ্ধর্ম রত্নাকর। বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৬, রেঙ্গুন, পৃ. ৪৪২।

[১২] সাক্ষাৎকার: বড়ুয়া, অর্নিবাণ। সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাঙামাটি সরকারি কলেজ, রাঙামাটি, ১৫/০৬/২০২৪

[১৩] বড়ুয়া, জগন্নাথ। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস (১৮০১-২০০০)। পিএইচডি থিসিস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ জুন, ২০১০, গাজীপুর, পৃ. ১৭৫।

[১৪] খান, আবদুল মাবুদ। বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৭, পৃ. ৬৪।

[১৫] বড়ুয়া, রেবতপ্রিয়। বৌদ্ধদের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান (প্রবন্ধ)। দীপঙ্কর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৬৫।

[১৬] বড়ুয়া, ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি। আবির প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, চট্টগ্রাম, পৃ. ২৫২।

[১৭] Ibid, Syncretism in Bangladesh Buddhism. Nagoya, Japan, 2002, p. 143.

[১৮] বড়ুয়া, জগন্নাথ। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মঃ অতীত ও বর্তমান। এমফিল থিসিস, পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ৩৪১।

[১৯] চৌধুরী, হেমেন্দু বিকাশ। ড. বেণীমাধব জন্মশত বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ। জগজ্জ্যোতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৯২, কলকাতা, পৃ. ১৭।

[২০] পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মঃ অতীত ও বর্তমান। পৃ. ৩৪১।

[২১] Chowdhury, Hemendu Bikash ed. Jagajjoti, Dr. B M Barua Birth Centenary Commemoration Volume, Baudha Dharmankur Sabha, 1989, Calcatta, p. 17.

[22] Chaudhury, Sukomal. Contemporary Buddhism in Bangladesh. 1987, Calcutta, PP. 5-6.

[২৩] সাক্ষাৎকারঃ বড়ুয়া, আশুতোষ। সহকারী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, নোয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ, রাউজান, চট্টগ্রাম, ২২/০৫/২০২৪

[২৪] পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মঃ অতীত ও বর্তমান। পৃ. ৩৪৫।

[২৫] বড়ুয়া, ড. বিমান চন্দ্র। বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মালম্বী বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ২০২।

[২৬] ভিক্ষু, শীলভদ্র। সুত্ত নিপাত (অনু.) মহাবোধি বুক সোসাইটি, ১৯৪১, কলকাতা, পৃ. ২৬৬।

[২৭] চাকমা, শরদিন্দু শেখর। চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ঃ ব্যুৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা (প্রবন্ধ)। অনোমা, রজত জয়ন্তি সংখ্যা, ২০০৯, চট্টগ্রাম, পৃ. ২১৩।

[২৮] মজিদ, মুস্তফা। আদিবাসী রাখাইন। দেশ প্রকাশ, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৩০।

[২৯] বড়ুয়া, চৌধুরী বাবুল। খুমিদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসব (প্রবন্ধ)। সমুজ্জল সুবাতাস, ২০০৮, বান্দরবান, পৃ. ১০৭।

[৩০] ম্রো, ইয়ং রিং। ম্রোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কয়েকটি উৎসব (প্রবন্ধ)। সমুজ্জল সুবাতাস, ২০০৫, বান্দরবান, পৃ. ৪৭।

[৩১] দেওয়ান, ইলিরা। বৈসাবি উৎসব ও কিছু করণীয়। যুগান্তর, ঢাকা, ৪ এপ্রিল ২০১০।

[৩২] চাকমা, শরদিন্দু শেখর। আদিবাসী মেলা উৎসব। চট্টগ্রাম, ২০০৬, পৃ. ৭৬।

[৩৩] চৌধুরী, ড. সুকোমল। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি। সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮০, বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ. ৮১।

[৩৪] বড়ুয়া বিপ্রদাশ (সম্পাদিত)। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রবন্ধ রাখাইন রাধাপোয়ে বা রথোৎসব, মংছেন চীনং (মং চিন), দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৬।

[৩৫] আলম, জাফর। কক্সবাজার পর্যটন সমস্যা ও সম্ভাবনা। চট্টল শিখা, ২০০১, ঢাকা / আজকের দেশ-বিদেশ, কক্সবাজার, ২৪ জুন, ২০০৪

[৩৬] দেওয়ান, বঙ্কিম কৃষ্ণ। চাকমা পূজা পার্বণ। জুমঘর প্রকাশনী, ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি, পৃ. ১৯।